সংসারী সাধু

—বনানী পাল ভট্টাচার্য্য

ঐশ্বর্য্য বলতে আমরা যা বুঝি, তা হল – টাকা পয়সা, গাড়ি-বাড়ি, এইসব। কিন্তু আরও একটি ঐশ্বর্য্য আছে, যাকে বলে, ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য। সাধু সঙ্গ করলে যা পাওয়া যায় বা বলা ভাল ঠাকুরের সঙ্গ করলে যা পাওয়া যায়। এটি এমন শক্তিশালী যে, সংসারে থেকেও এনারা আলাদা থাকেন। সংসারী সাধু।

আমার প্রথম দেখা এরকম ব্যক্তি হলেন আমার বাবা। Central Govt. - এর ভাল পদে থাকা স্বত্ত্বেও কোনও দিন সেরকম বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিনি। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''তুমি টাই পরে অফিসে যাও না কেন?'' উত্তর এসেছিল, ''টাই পরলেই অফিসার হওয়া বোঝায়, আর না পরলে বোঝায় না, এরকম কে বলল? আর তাছাড়া আমার এসবের প্রয়োজন নেই, তাই পরি না। ঈশ্বর দিচ্ছেন বলেই অপব্যবহার করব, এটা ঠিক নয়! বড় হও বুঝবে!'' এত সাধারণ ও সহজভাবে জিনিসগুলিকে দেখা, যার তার ব্যাপার নয়। এতে অবশ্যই সাধনা লাগে। ঈশ্বরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারলে, এই গুণগুলি সহজেই আয়ত্ত হয়।

ভবানীপুরে এসে ঠাকুরের কৃপায় আমার এরকম অনেক সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছে। যেমন চ্যাটার্জী জ্যেঠু (সুহাস চ্যাটার্জী)। ৬ ফুট-এর ওপর লম্বা মানুষটি ছিলেন IB (Intelligence Bureau) Officer। কিন্তু আশ্রমে যেন এক অন্য মানুষ! সমস্যা যত জটিলই হোক না কেন, হাসি মুখে অদ্ভুত সমাধান বের করে দিতেন। সমস্যা যেন সমস্যাই নয়। একবার একদিন মা দুঃখ করে জ্যেঠুকে বলছিলেন, ''আমার পছন্দ করা ছেলে ওর পছন্দ নয়...''। জ্যেঠু একগাল হেসে বললেন, ''ঠিক আছে, কাউকে তো পছন্দ করেছে, প্রেমই তো করেছে, কাউকে খুন তো করেনি। ক্ষমা করে দাও। তুমি ভাল না থাকলে ও ভাল থাকবে কি করে!'' আমার রান্নার হাতেখড়ি জ্যেঠুর কাছেই। প্রথমবার ঠাকুরকে ভোগ রান্না করে নিবেদন করে বাইরে ডুমুরতলায় এসেছি। জ্যেঠু জিজ্ঞাসা করলেন, ''ঠাকুরকে জোরে জোরে বলেছিস খাবারটা খেয়ে নিতে?'' আমি বললাম, ''না তো, মনে মনে বলেছি''। তখন জ্যেঠু একগাল হেসে বলেছিল, ''ওরে বোকা, মনে মনে বললে ঠাকুর জানবে কেমন করে যে তুই খাবার দিয়ে এসেছিস? যা আবার বলে আয়।'' ঐদিনই একজন ভদ্রলোক, আমাকে দেখিয়ে, জ্যেঠুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি কে হই? উনি বলেছিলেন, ''ও আমার ভাইয়ের মেয়ে, মানে আমারই মেয়ে''। এক জনৈক ব্যক্তিকে একবার বলতে শুনেছিলাম, ''ওনাকে পাথরের মূর্তি ভেব না''। রোগ যেন ওনার কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। শরীরের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ''রোগ রোগের মত আছে, তবে আমি বেশ (ভাল) আছি''। একবার বলেছিলেন, ''সাহস করে একদিন সত্যি কথা বলা শুরু কর। দেখবি আর কোনও দিন বাধা আসবে না।'' এই সরল সাহসিকতা, উদারতা ঐশ্বর্য্য বৈ আর কি?

এবার আসি ওনার স্ত্রী মঞ্জরী জ্যেঠির কথায়। আমাদের একটু মাথা যন্ত্রণা করলেই সকলকে বলে বেড়াই, কতও কি করে বেড়াই তার হিসেব নেই, অথচ উনি ৭৮ বছর বয়স হয়েও একদিন দেখি ভবানীপুরে এসেছেন, পা দিয়ে রক্ত পড়ছে ওনার। সুশান্ত দা bandage করে দিচ্ছেন। কি ব্যাপার জানতে চাইতে, হেসে হেসে বললেন যে হাজরা মোড়ে পড়ে গিয়ে আঙ্গুল কেটে রক্ত বেরচ্ছিল। ওই অবস্থাতেই হেঁটে হেঁটে ভবানীপুরে চলে এসেছেন। আমরা হলে হয়ত বাড়ি ফিরে যেতাম। ঠাকুরের আকর্ষণটাই প্রধান।

আরও একজন পিসির কথা না বললেই নয়। প্রতিমা পিসি। নিজের জমানো পুঁজি থেকে ষাট লক্ষ টাকা আশ্রমের উদ্দেশ্যে দিয়ে দিয়েছেন। হাঁটতে অসুবিধা হয়, শরীরে অনেক সমস্যা, তারপরেও পাঠ ও আলোচনা যেদিন হয়, বেশিরভাগ দিনই উপস্থিত থাকেন। ভবানীপুরে প্রতিনিয়ত আসতে আসতে কখন অন্তর থেকে স্বার্থহীন হয়ে ওঠা যায়, কেউ বলতে পারে না।

আমার মা, গুরুমা ও আরও অনেকে আছেন (যাদের কথা পরে আবার লিখব), এঁদের ঠাকুরের প্রতি ভালবাসাই এঁদের জীবনের সাধনা। এই সাধনার ফলেই এনারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে একজন নিঃস্বার্থ মানুষ স্বরূপ। এবার প্রশ্ন হল, এঁদের জীবনে অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এনারা এত শান্ত থাকেন কি করে?

স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজীকে হিমালয়ের এক সাধু বলেছিলেন, ''শান্ত মনে কে সংসার করে?'' উনি লিখছেন, ''আমরা কিন্তু আদপে এভাবে ভাবি না। আমাদের মনে হয় – সংসারের জ্বালায় মন অশান্ত হচ্ছে; লোকের ব্যবহার, টাকাপয়সার চিন্তা, শরীরের সমস্যা, ছোট-বড়দের নানা সমস্যা প্রভৃতি কারণে মন আর শান্ত হতেই পারে না। কিন্তু ঐ সাধুর কথা দিয়ে যদি বোঝার চেষ্টা কর, দেখব উনি ঠিক এর উলটো কথাটা বলেছেন – ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'counter intuitive'। তাঁর মতে – আমাদের মন এত অশান্ত বলেই সংসারকে এত যন্ত্রণাময় মনে হয়।''

ঠিকই। তাই দরকার সাধুসঙ্গ। এনারা নিজেদের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দেন যে ঈশ্বরে সহজ সরল বিশ্বাস রেখে, তাঁকে ক্রমাগত স্মরণ করে চললে, জীবনের অস্থিরতা গুলি থেকে সহজেই বেরিয়ে আসা যায়। সাধু সঙ্গ করতে করতে একদিন সাধু হয়ে যাওয়া। ''সাধু'' অর্থাৎ যিনি সাধনা করেন। কিসের সাধনা? ঈশ্বরের সাধনা, যা থেকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সে যে কেউ হতে পারেন। এই নয় যে গেরুয়া পরে ঘুরে বেড়াতে হবে, সব কিছু ছেড়ে। এ পথ খুব কঠিন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাও সকলে পারেন না শুনেছি। পরনে গেরুয়া বস্ত্র হলেও অন্তর থেকে সব বন্ধন ছিন্ন করা খুব কঠিন যে। কিন্তু সংসারীদের জন্যে যেন এ আকাশ-কুসুম ভাবনা ছাড়া আর কিছু নয়।

আর এখানে এই পথ আরও সহজ করে দিয়েছেন ঠাকুর। এখানে সংসারীরা আসেন ঠাকুরের কাছে, নিজেদের কামনা বাসনা প্রার্থনা করেন, দুঃখ থেকে মুক্তির প্রার্থনা করেন, গল্প করেন, হাসি ঠাট্টা করেন, হয়ত ঠাকুরের নাম জপ করতেই ভুলে যান। কিন্তু এই ভাবেই বারংবার আসতে আসতে হঠাৎ কোনদিন দেখা যায় যে মানুষটির ভেতরটা সম্পূর্ণ পালটে গেছে – ঠিক ম্যাজিকের মতো। কারণ ঠাকুর নিজেই এখানে হাত ধরেন। এখানে কেউ গেরুয়াধারী সাধু নয় ঠিকই, তাও ঠাকুরের আশীর্বাদে এনারা এইপ্রকার

ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে ওঠেন। তখনই এঁরা মণি-রত্নের মত ঝকমকিয়ে ওঠেন। তাই এনারা এক একজন সংসারী সাধু।

ঠাকুর সকলকে খুব ভাল রাখুন, ওনার ঐশ্বর্য্যে ভরে তুলুন এই প্রার্থনা থাকল ওনার কাছে।

কবিগুরুর লেখা দিয়ে শেষ করি,

''হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।
সংসারে যা দিবে মানিব তাই,
হৃদয়ে তোমায় যেন পাই।।''

তথ্য ঃ উদ্বোধন পত্রিকা